মোহম্মদ বরকতুল্লাহ
সাহিত্যসাধনা ও চিন্তাধারা

হাবিব আর রহমান

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ : সাহিত্যসাধনা ও চিন্তাধারা
হাবিব আর রহমান

প্রকাশকাল
প্রথম কবি প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Mohammad Barkatullah: Sahityasadhona O Chintadhara by Dr. Habib Ar Rahman Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2021
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95041-9-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

আমার অকাল-প্রয়াত বন্ধু
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাংলা বিভাগের শিক্ষক
মোহম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের
স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

মাধ্যমিক শ্রেণিতে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর 'পারস্য প্রতিভা'র অন্তর্ভুক্ত 'শেখ সাদী' রচনাটি বাংলা সংকলনে আমাদের পাঠ্য ছিল। সেই বয়সেই রচনাটির ধ্বনি-ঝংকৃত গতিময় গদ্যভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে এর প্রারম্ভিক অংশ আমার কানে ও প্রাণে ধ্বনির জল-তরঙ্গ তুলেছিল : "একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোনও আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন, বাল্য বন্ধু শেখ সাদীর দ্বারা যেন তাঁহার জীবনের শেষ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। দেখিতে দেখিতে একদিন তাঁহার জীবনের কৃষ্ণ-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ব্যথিতের আর্তনাদকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া তাঁহার জীবনের কুন্দু-কুসুম নীরবে ঝরিয়া গেল।"

এক দুর্নিবার আকর্ষণে 'পারস্য প্রতিভা' সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ পড়ে ফেলি। আমার কিশোর মনে জ্ঞানের এক বৃহৎ জগৎ উন্মোচিত হয়ে যায়। সাহিত্যে অনুরাগ আগেই কিছুটা ছিল। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হলো ইতিহাস আর দর্শন। এই তিনটি বিষয় আজও আমার কাছে সমানভাবে প্রিয়। জ্ঞানানুরাগ সৃষ্টিতে বরকতুল্লাহর এই গ্রন্থটির প্রেরণাদায়ী ভূমিকাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু বরকতুল্লাহর সাহিত্যকর্ম নিয়ে কখনো আলোচনা গ্রন্থ লিখতে পারব তা ভাবতে পারি নি। পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা করতে গিয়ে বরকতুল্লাহকে অভিসন্দর্ভের একটি অপ্রধান অংশ হিসেবে আমাকে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সে-রচনাটি ছিল একটি বড় প্রবন্ধের মতো। ফলে আমার মনে যথেষ্ট অতৃপ্তি ছিল। আজ আমি আনন্দিত যে তাঁর সাহিত্যসাধনা নিয়ে ক্ষুদ্র কলেবরের হলেও একটি গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছি।

আমাদের সাহিত্য-আলোচকদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রয়াত অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্ম ও ভাষাভঙ্গি নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সে-সব রচনা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিছু-বা অপ্রকাশিত থাকতে পারে। শুনেছি বরকতুল্লাহ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু অকাল প্রয়াণ তাঁর সে-ইচ্ছাকে পূরণ করতে দেয় নি। আমি আমার এই পূর্বসূরি আলোচকের লেখা থেকে উদারভাবে সাহায্য নিয়েছি। তাঁকে কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দেয়ার উপায় নেই।

এ বছর বরকতুল্লাহর জন্মশতবর্ষ। আমরা বিস্মরণ ও অধঃপতনের এমন এক স্তরে পৌঁছেছি যে আমাদের দেশের এই বিশিষ্ট লেখক ও বাংলা একাডেমির প্রথম বিশেষ কর্মকর্তাকে (এখন যে-পদটির নাম মহাপরিচালক) তাঁর জন্মশতবর্ষেও (১৯৯৮) স্মরণ করার তাগিদ বোধ করি নি। ইউনিভার্সিটি বুক কর্ণার-এর কর্তৃপক্ষ তাঁদের নগণ্য সাধ্য নিয়ে জন্মশতবর্ষের উপান্ত সময়ে হলেও যে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

হাবিব আর রহমান

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ যে প্রকাশিত হচ্ছে, তার প্রথম কৃতিত্ব মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায় নব্বই বছর বয়সী জনাব মুহম্মদ আসাদুল্লাহর। তাঁর পিতা সম্পর্কে সম্ভবত অদ্যাবধি একমাত্র এই বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয়ে পাঠকের কাছে সহজলভ্য হোক—এটি তিনি একান্তভাবে কামনা করেছেন। এমনকি এর জন্য তিনি অর্থায়নও করতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি কবি প্রকাশনীর তরুণ স্বত্বাধিকারী স্নেহভাজন সজল আহমেদকে জানালে তিনি সানন্দে বইটি প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু অর্থ গ্রহণে সম্মত হন না। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে স্বীকার করা নৈতিক দায়িত্ব যে, বইটি প্রকাশের দ্বিতীয় কৃতিত্ব সজল আহমেদের।

বইটির প্রথম প্রকাশে নাম ছিল 'মোহম্মদ বরকতুল্লাহ : জীবন ও সাহিত্য সাধনা'। এবার নামে একটু পরিবর্তন ঘটিয়েছি। পরিবর্তন ঘটেছে লেখক-নামেও। তবে আমূল কিছু নয়। এক সময় হাবিব রহমান নামে লিখতাম। কিন্তু ড. রহমান হাবিব নামে একজন লেখকের সঙ্গে আমার নামের এতটা বিভ্রান্তি ঘটতে থাকে যে—এমনকি উচ্চ শিক্ষিত পাঠক-মহলেও—বাধ্য হয়ে নিজের নামের মধ্যবর্তী স্থানে আরবি ব্যাকরণের নিয়মে 'আর' ব্যবহার করে নিজের লেখক-নাম পুনর্বিন্যাস করে নিতে হয়েছে।

একেবারেই ব্যক্তিগত কারণে কম্পোজ থেকে শুরু করে সবকিছু নিজউদ্যোগে সম্পাদন করে বইটি ১৯৯৮ সালে প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু সে-প্রকাশনা ছিল সৌষ্ঠবহীন। আর যে-প্রকাশকের নাম ব্যবহার করেছিলাম তাদের বিপণন ব্যবস্থা এতটা দুর্বল ছিল যে সে-বই খুব স্বল্পসংখ্যক পাঠকের হাতে পৌঁছতে পেরেছিল। কবি প্রকাশনীর এই রুচিশীল মুদ্রণ আমাদের সবার প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে আশা করি।

মুজগুন্নি আবাসিক এলাকা
খুলনা।

হাবিব আর রহমান
Email: drhabibiu@gmail.com

সূচিপত্র

জীবন ও মানস-গঠন ১১
পারস্য প্রতিভা পরিক্রমা ১৯
মানুষের ধর্ম : দর্শনের গহনলোকে ৩৯
জীবনী ও ইতিহাস : ইসলামের আদি যুগ সন্ধান ৫৫
প্রবন্ধ ও অভিভাষণ : প্রতিফলিত চিন্তাধারা ৭৫
উপসংহার ৯৩

জীবন ও মানসগঠন

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) একটি বিশিষ্ট নাম। সৃষ্টিধর্মী রসসাহিত্যের বিচারে যাঁদের আমরা সাহিত্যিক বলি তিনি সে-অর্থে সাহিত্যিক ছিলেন না। লেখক-জীবনে তাঁর মনোযোগের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের আদি যুগের ইতিহাস, ফারসি সাহিত্য ও দর্শন। এছাড়া স্বতন্ত্র কিছু প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। তাই লেখক হিসাবে তাঁর মূল পরিচয় একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসাবে।

বরকতুল্লাহর দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ ‘মানুষের ধর্ম’ বাদে অন্য প্রায় সমস্ত রচনার বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে তাঁর মূল মানস-বৈশিষ্ট্যটি সহজে বোঝা যায়। তিনি ছিলেন মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একজন অনুরাগী পাঠক ও রূপকার। তাঁর রচনাবলিতে এ পরিচয়টিই সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট। ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও কৃতি নিয়ে দুটি ভিন্ন নামে তিনি দীর্ঘকলেবর গ্রন্থ লিখেছিলেন। এছাড়া লিখেছিলেন হযরত ওসমানের জীবনী ও কারবালার ইতিহাসসম্মত কাহিনি। তাঁর বহুখ্যাত ‘পারস্য প্রতিভা’ও মুসলিম পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কতিপয় কবি-লেখক-সাধকের কৃতি ও জীবনকাহিনি। এমনকি স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলিতে সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটলেও সেগুলোরও কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে মুসলিম সমাজ। এদিক থেকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে বরকতুল্লাহকে বিগত শতাব্দীর ‘সুধাকর দল’-এর একজন মননশীল উত্তরসুরি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইংরেজ আমলে হতচেতন ও অধঃপতিত বাঙালি মুসলিম সমাজকে ইসলাম ধর্মের সুমহান বাণী ও গৌরবকাহিনি শুনিয়ে তাদের আত্মসচেতন ও ইসলমমুখী করে তোলার জন্য উনিশ শতকের শেষ দিকে কয়েকজন মুসলিম লেখক কলকাতায় সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। ‘সুধাকর’ (১৮৮৯) নামক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন বলে কেউ কেউ এঁদের ‘সুধাকর দল’ নামে অভিহিত করেছেন।[১] প্রধানত এঁদের দ্বারাই বাংলা গদ্যে ইসলামের ধর্ম, ইতিহাস, জীবনী, গৌরবগাথা ইত্যাদি কীর্তিত হতে থাকে। খ্রিস্টান পাদরিদের আক্রমণ থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করাও সেদিন তাঁদের অন্যতম উদ্দশ্য ছিল।[২] এই সুধাকর দলের প্রদর্শিত পথে পরবর্তীকালে অনেক মুসলিম লেখক পদচারণা করেছেন এবং তাঁদের কিছু কিছু রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মূলত এই ধারারই লেখক। একজন সমালোচক তাঁর এ দিকটি সম্পর্কে লিখেছেন :

> এ যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বাঙালি মুসলমানের কাছে বরকতুল্লাহ একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের বাণী নিয়ে উপস্থিত। তাঁর সাহিত্য সাধনা মুসলমানের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারণের পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছে।[৩]

তাঁর জীবনীকার লিখেছেন—

> শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত করে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ উত্তরকালে রাজকার্যে নিয়োজিত থাকলেও তাঁর মধ্যে ছিল একজন আনন্দিত চৈতন্যের মানুষ যিনি মুসলমানদের জাতীয় ঐতিহ্যের উপলব্ধিকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছে পোষণ করেন।[৪]

বাংলা সাহিত্যে বহমান এই মুসলিম ধারাটিতে বরকতুল্লাহর ছিল একটি সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তিনি এর মধ্যে এনেছিলেন মননশীলতার দীপ্তি। আসলে রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৫), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৪৯), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) প্রমুখের মধ্যে দিয়ে মনীষার যে-ধারাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তিনি সেই ধারারই যোগ্য অনুসারী ছিলেন। মেধাবী বরকতুল্লাহ দর্শন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। কর্মজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। এভাবে তিনি এক বিপুল মানস-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। উত্তরসূরিদের জন্য সেই সম্পদ তিনি দান করে গেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে।

বরকতুল্লাহর মনীষা শুধু জ্ঞানচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি একজন উচ্চশ্রেণির ভাষাশিল্পীও ছিলেন। ‘পারস্য প্রতিভা’ ও ‘মানুষের ধর্ম’-এ তিনি ধ্বনিসম্পদে ভরপুর যে-কবিত্বময় গদ্য লিখেছিলেন তা যে-কোনো পাঠককে আকৃষ্ট না করে পারে না। অবশ্য সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে যে-প্রত্যাশা তিনি জাগিয়েছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ পর্বে তা সম্পূর্ণ বজায় রাখতে পারেন নি। তবু এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাঙালি মুসলমানের জীবনে জ্ঞানচর্চা, মনন ও ভাবনার ক্ষেত্রে বিরাজমান দৈন্য মোচনে যে-অক্লান্ত সাধনা তিনি করেছিলেন তার তুলনা বড় বেশি মেলে না।

দুই

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত ঘোড়শাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালের ২রা মার্চ। বাংলার অসংখ্য গ্রামের মতো এটিও সে-সময় ছিল একটি অজ পাড়াগাঁ।[৫] কিন্তু তাহলেও বরকতুল্লাহর পিতা হাজী আজম আলী ছিলেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, পেশায় কবিরাজ। ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল।[৬] হাজী আজম আলী পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বরকতুল্লাহর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহম্মদ রহমতুল্লাহ

লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। অবসর সময়ে তিনি কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করতেন বলে জানা যায়।[৭]

শৈশব থেকেই বরকতুল্লাহর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেলতৈল মিডল ইংলিশ স্কুল থেকে তিনি নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও এম.ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। ১৯০৯ সালে এম.ই পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় তিনি বিভাগীয় ইন্সপেক্টর কর্তৃক পুরস্কৃত হন।[৮]

বি.এ পরীক্ষা দেয়ার পর বরকতুল্লাহ সংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। একমাত্র অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যু হয়েছিল আগেই। ফলে পড়াশোনা চালানো সম্ভব হবে না ভেবে বাড়ির কাছে একটি নতুন হাইস্কুলে হেডমাস্টারি নিয়েছিলেন এবং ঠিক করেছিলেন সেখানেই থেকে যাবেন। কিন্তু বিদ্যোৎসাহী শ্বশুর ও ভগ্নিপতির সহযোগিতায় ১৯১৮ সালেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম.এ শ্রেণিতে ভর্তি হন।[৯] তখনকার অনেক ছাত্রের মতো বরকতুল্লাহও এম.এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়তে থাকেন। একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে তখনকার দিনে শিক্ষিত মানুষের চাকরি সুলভ ছিল। কিন্তু ধারণাটি সত্য নয়। সেজন্য দেখা যায় সে-সময়ে অনেক শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়াকালে একই সঙ্গে আইনে স্নাতক অর্থাৎ বি.এল ডিগ্রি অর্জনের জন্যও পড়াশোনা করতেন। যা-ই হোক ১৯২০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ স্থান পেয়ে তিনি এম.এ পাস করেন। তাঁর বরাবরের ইচ্ছা ছিল শিক্ষকতা করার। কিন্তু সে-সুযোগ তিনি পান নি।[১০] ১৯২২ সালে আইন পাস করে তাই পাবনা জজ কোর্টে ওকালতির উদ্দেশ্যে সনদ গ্রহণ করেন।

সরকারের সিভিল সার্ভিস পদে লোক নিয়োগের জন্য ১৯২২ সালে প্রথম বি. সি. এস (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। এর আগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হতো নমিনেশনের দ্বারা। ১৯২১ সালে বরকতুল্লাহ রাজশাহী বিভাগ থেকে ডেপুটি পদের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং ইন্টারভিউতে প্রথম নমিনেশন পেয়েছিলেন। কিন্তু তদবিরের জোরে চাকরি পেয়েছিলেন দ্বিতীয় নমিনেশনপ্রাপ্ত ব্যক্তি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় বরকতুল্লাহ এবার নিজের যোগ্যতার স্বীকৃতি পেলেন। প্রথম বি. সি. এস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর বরাবরের ইচ্ছা ছিল অধ্যাপনা করার। ডেপুটির চাকরি তাঁর মনঃপুত ছিল না। তবু সংসারের চাপে শেষ পর্যন্ত সেই চাকরিই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।[১১]

১৯২৩ সালের মে মাসে বরকতুল্লাহ ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসাবে চাকরিতে যোগদান করেন। সেই থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বাংলা প্রদেশের নানা স্থানে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে নিজের কর্তব্য

পালন করেন। ১৯২৪-এ দায়িত্ব পান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের। এ পদে ছিলেন শ্রীরামপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পরে সাবডিভিশনাল অফিসার হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন জামালপুর, বহরমপুর ও বাগেরহাটে। মাঝখানে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ সমবায় ও ঋণসালিশী বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসাবে প্রায় পাঁচ বছর কর্মরত ছিলেন। পরে কিছুকাল সিভিল সাপ্লাই বিভাগে কাজ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বরকতুল্লাহ ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হন। পরে জেলা প্রশাসক হিসাবে বদলি হন কুষ্টিয়ায়। তারপর আবারও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, এবার ময়মনসিংহে। পরে আবার জেলা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পান বরিশাল জেলার। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে জেলা প্রশাসন থেকে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসাবে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে এই পদ থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।[১২]

আমলা হিসাবে বরকতুল্লাহর দায়িত্বের অবসান ঘটলেও বিদ্বান, বিজ্ঞ ও লেখক বরকতুল্লাহর দায়িত্ব দেশের কাছ থেকে তখনো শেষ হয় নি। ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে বিশেষ কর্মকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তার আগেই ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার অন্তর্ভুত বাংলা ভাষার গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার ষোড়শ দফাটি কার্যকর করার উদ্যোগ যখন নেয়া হয় তখন তাঁকেই তার পরিকল্পনা রচনার ভার দেয়া হয়। বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করার জন্য যে-বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য।[১৩]

১৯৫৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির বিশেষ কর্মকর্তার দায়িত্ব থেকে বরকতুল্লাহ অব্যাহতি পান। কিন্তু তাহলেও একাডেমির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রায় আমৃত্যু বজায় ছিল। ১৯৫৭-র আগস্টে সরকার কর্তৃক বাংলা একাডেমির আয়োজক সমিতিকে একাডেমির কাউন্সিলের মর্যাদা দান করা হলে বরকতুল্লাহ তাঁর সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮-তে গঠিত একাডেমির প্রথম নির্বাচিত পরিষদের একটি শূন্য পদের উপ-নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬২-৬৩ সালে মনোনীত হয়েছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি পদে।[১৪]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান ও কর্মজীবনে কৃতিত্বের জন্য মোহম্মদ বরকতুল্লাহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তিত হলে প্রথম বছরেই তিনি প্রবন্ধের জন্য উক্ত পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তাঁকে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৩-তে পান দাউদ সাহিত্য পুরস্কার। ১৯৭০-এ পান

পাকিস্তান সরকারের Presiden's medal for pride of performance পুরস্কার। ১৯৮৪ তে তাঁকে দেয়া হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (মরণোত্তর)।

সাদামাটা সরল জীবনযাপনে উন্নত-গভীর চিন্তাচর্চাকে যাঁরা জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ছিলেন সেই গোত্রের মানুষ। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার আগেই বিয়ে করেছিলেন। সরকারি চাকরি পাওয়ার পর কর্মজীবনে ক্রমশ উন্নতি ও আর্থিক নিশ্চিন্তি এলেও সংসারে লোকসংখ্যা বেড়েছে। স্ত্রী, চার পুত্র ও ছয় কন্যা নিয়ে সংসারটা বেশ বড়। কাজের লোক যারা ছিল তারাও পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হতো। সেই সাথে 'দেশ' থেকে নানা কাজে আসত আত্মীয়-স্বজন। ফলে সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহ কষ্টকরই ছিল। নিজে মিতব্যয়ী ছিলেন। সন্তানদের সেইভাবে গড়ে তুলেছিলেন।

শেষ জীবনে বরকতুল্লাহ প্রস্টেট গ্লান্ড বৃদ্ধিজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ১৯৭৪ সালে মে মাসে তাঁর অপারেশন হয়, কিন্তু ক-মাস পর ২ নভেম্বর ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিন

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জন্মভূমি ঘোড়শাল পল্লীগ্রাম হলেও যে-পারিবারিক প্রতিবেশে তিনি জন্মেছিলেন ও লালিত হয়েছিলেন তা তাঁর মানসগঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল বলে ধারণা হয়। পিতা শুধু শিক্ষিতই ছিলেন না, ছিলেন প্রশংসনীয় রূপে ধার্মিক। পুত্র-কন্যাদের তিনি সেভাবেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কেবল বিদ্যার্জন ও ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও বরকতুল্লাহ পরিবারের মধ্য থেকে প্রাণিত হওয়ার রসদ পেয়েছিলেন। তাঁর বড় ভাই কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করতেন। যদিও সে-সব লেখা প্রকাশিত হয় নি তবু মনের তাগিদে তিনি লিখতেন। গোলাম সাকলায়েন জানিয়েছেন সে-সব লেখা বেশ মানসম্পন্ন ছিল।[১৪] বড় ভাইয়ের সাহিত্যচর্চার প্রতি এই প্রবণতা মেধাবী বালক বরকতুল্লাহর মনেও নিশ্চয় সৃষ্টির বাসনা জাগিয়ে তুলত। এর প্রমাণও আছে। বেলতৈল এম.ই স্কুলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় রচিত ২৫টি কবিতা নিয়ে 'পদ্যলহরী' নামে একটি সংকলন তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তা ছাপা হয় নি।[১৬]

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলা বিভক্ত হলে যে-স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং যা ছাত্র সমাজকে নানাবিধ কর্মকাণ্ডে উজ্জীবিত করে তা-ও বরকতুল্লাহকে সাহিত্যচর্চায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছিল বেলতৈল স্কুলেও। সেখানে প্রতি শনিবার বিকেলে ছাত্ররা বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সভা করত। সেই সভায় দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ ও কবিতা পড়া হতো। ছাত্রদের শরীর গঠনের জন্য স্কুলে প্রতিদিন ব্যায়াম ও কুস্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে

বরকতুল্লাহ কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। তঁর জীবনে এর ফল হয়েছিল শুভ। নিজেই তিনি স্বীকার করেছেন,

> ...স্বদেশী কর্মীদের সঙ্গে কিছুকাল কাজ করায় আমি ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছিলাম। কারণ তাদের দেখাদেখি দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতে ঐ সময়ে অভ্যস্ত হই। তা ছাড়া বহু গ্রন্থ পাঠের জন্য প্রেরণা পাই; গ্রন্থও পাই এবং দেশ বিদেশের কথা পড়ে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। তার ফলেই এম-ই পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে আমি বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিলাম এবং বিভাগীয় ইন্সপেক্টর হতে কয়েকখানি বই পুরস্কার পেয়েছিলাম। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা ও চারিত্রিক সংযম শিক্ষার ফলে আমার দেহ ও মন সুগঠিত ও কষ্টসহ হয়েছিল।[১৭]

শাহজাদপুর হাইস্কুলে পাঠকালে মুসলিম বিশ্বের নানা কীর্তি-কাহিনী শুনে বকতুল্লাহর মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। ত্রিপোলি যুদ্ধে (১৯১১) তরুণ সেনাপতি আনোয়ার পাশার অসীম বীরত্ব, বলকান যুদ্ধে (১৯১২) সেনাপতি শুকরী পাশার সাহসিকতা, ভারতবর্ষ থেকে ডাঃ আনসারী ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১) স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তুর্কিপক্ষে যোগদান ও যুদ্ধশেষে খলিফার কাছ থেকে খেলাত ও সোনার মেডেলে ভূষিত হয়ে ফিরে আসা, বিপ্লবী জামাল উদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-১৮৯৭) জীবনকথা—ক্লাসে বসে ফারসি শিক্ষকের কাছে এসব কাহিনি শুনতে শুনতে বরকতুল্লাহর কিশোর মন কল্পনার জগতে উধাও হয়ে যেত।[১৮] এখানে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে ‘দুঃখিনী’ নামে হাতে লেখা একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন।[১৯]

১৯১৪ সালে বরকতুল্লাহ যখন রাজশাহী কলেজে পড়তে যান তখন রাজশাহীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল খুবই প্রাণময়। তাঁর লেখক জীবনে এই পরিমণ্ডলও বিশেষ প্রভাব রেখেছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি তখন অত্যন্ত সজীব। এর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মকর্তাদের অন্যতম সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্কমোচনকারী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র (১৮৬১-১৯৩০) অসাধারণ বাগ্মিতায় বরকতুল্লাহ আরও অনেক ছাত্রের মতো অন্তরে প্রেরণা পেতেন। প্রেরণাসৃষ্টিকারীদের মধ্যে এছাড়ও ছিলেন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক রমাপ্রসাদ চন্দ (১৮৭৩-১৯৪২; পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ), খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক (১৮৮৫-১৯৮২) এবং আরও কয়েকজন অধ্যাপক। ১৯১৫ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে দেশের অনেক সাহিত্যিককে একসঙ্গে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। বরকতুল্লাহ সম্মেলনের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন।[২০]

রাজশাহী কলেজে বরকতুল্লাহ চার বছর পড়েছিলেন। এ সময়ে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা প্রকাশিত হয়। উন্নতমানের কলেজ-বার্ষিকীতে তিনি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতেন। ‘ভগ্ন দেউল’ ও ‘পদ্মা বক্ষে’ নামক দুটি প্রবন্ধ ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। দেখা যায় ‘পারস্য প্রতিভা’র ভিত রচিত হয়েছিল এখানে থাকতেই। কেননা কলেজ-বার্ষিকীতে তিনি ধারাবাহিকভাবে কবি